

বিনিয়োগ বাড়াতে প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা কেন জরুরি

বাংলাদেশে একজন উদ্যোক্তা যখন একটি কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার হিসাব শুধু জমির দাম, শ্রমিকের মজুরি, বিদ্যুতের খরচ কিংবা করের হারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি কারখানা ১৫ থেকে ২০ বছর, কখনো তারও বেশি সময় ধরে চলতে পারে। ফলে বিনিয়োগকারী শুধু একটি ব্যবসায় অর্থ ঢালেন না, তিনি আসলে দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি দেশের ওপরও আস্থা রাখেন।

আজ যে নিয়মে তিনি বিনিয়োগ করছেন, পাঁচ বা দশ বছর পর সেই নিয়ম কতটা বহাল থাকবে? চুক্তি নিয়ে বিরোধ হলে আদালতে নিরপেক্ষ প্রতিকার পাওয়া যাবে কি? আজ পাওয়া সরকারি অনুমোদন আগামীকালও কার্যকর থাকবে তো? প্রভাবশালী কোনো প্রতিযোগী কি নিয়ম বদলে নিজের পক্ষে নিতে পারবে? হঠাৎ কোনো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত কি পুরো বিনিয়োগের হিসাব পাল্টে দিতে পারে?

এসব প্রশ্ন কোনো প্রতিষ্ঠানের হিসাবের খাতায় সরাসরি লেখা যায় না। কিন্তু বিনিয়োগকারী এগুলোকেও একটি মূল্য নির্ধারণ করেন। অর্থনীতির ভাষায় সেটি ঝুঁকি বা ‘রিস্ক প্রিমিয়াম’।

যে দেশে প্রতিষ্ঠান ও নিয়মের ওপর আস্থা বেশি, সেখানে বিনিয়োগের ঝুঁকিও তুলনামূলক কম। কিন্তু নিয়ম যদি অনিশ্চিত হয়, চুক্তি বাস্তবায়ন কঠিন হয় এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে অতিরিক্ত বিবেচনা মূলক ক্ষমতা থাকে, বিনিয়োগকারী সেই ঝুঁকির বিপরীতে বেশি মুনাফা চাইবেন। কেউ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের বদলে সুযোগসন্ধানী ব্যবসা বেছে নেবেন। কেউ হয়তো অন্য দেশেই চলে যাবেন।

এই কারণেই প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা শুধু রাজনৈতিক বা তাত্ত্বিক বিষয় নয়। এর সরাসরি অর্থনৈতিক মূল্য আছে।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। প্রায় ১৭ কোটি মানুষের বাজার, বিশাল শ্রমশক্তি, প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন খাত, বঙ্গোপসাগরের প্রবেশাধিকার এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থান, সব মিলিয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় হওয়ার কথা। তৈরি পোশাক খাত ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারে। তারপরও দেশের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার তুলনায় বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বাড়ছে না।

আইএমএফের হিসাবে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল জিডিপি প্রায় ২৪ দশমিক ১ শতাংশ। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা প্রায় ২৩ শতাংশে নেমে আসার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আঙ্কটাডের হিসাবে, কয়েক বছরের দুর্বলতার পর ২০২৫ সালে এফডিআই বেড়ে প্রায় ১৭৭ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। এটি ইতিবাচক। তবে এই

বৃদ্ধির বড় অংশ এসেছে বিদ্যমান বিদেশি প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিনিয়োগ করা মুনাফা ও আন্তকোম্পানি ঋণ থেকে। একবারে নতুন বিদেশি বিনিয়োগের বড় ঢেউ এখনো দেখা যায়নি।

তাই প্রশ্ন হলো বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কেন আসছেন না, তা নয়। বাংলাদেশে যারা ইতোমধ্যে ব্যবসা করছেন, তাদের অনেকেই এখানে সম্ভাবনা দেখছেন। আসল প্রশ্ন হলো, সেই সম্ভাবনা আরো বড় এবং দীর্ঘমেয়াদি নতুন বিনিয়োগে রূপ নিচ্ছে না কেন?

এর একক কোনো কারণ নেই। জ্বালানিসংকট, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, অর্থায়নের ব্যয়, দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি, বন্দর ও পরিবহন সমস্যা, আমলাতন্ত্র, বিনিময় হারের অনিশ্চয়তা এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই তালিকায় প্রাতিষ্ঠানিক অনিশ্চয়তাকেও রাখতে হবে।

বিশ্বব্যাংকও বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগের দুর্বলতার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক অনিশ্চয়তা, অবকাঠামোগত সমস্যা এবং ব্যবসা পরিচালনার বিভিন্ন বাধা সংক্রান্ত কথা বলেছে। ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করা এবং নীতি ও বিধিবিধানের অনিশ্চয়তা কমানোর ওপর তারা গুরুত্ব দিয়েছে।

একজন বিনিয়োগকারী সাধারণ ব্যবসায়িক ঝুঁকির অনেকটাই হিসাব করতে পারেন। শ্রমিকের মজুরি, পরিবহন ব্যয়, বিনিময় হার কিংবা বাজারে পণ্যের সম্ভাব্য চাহিদার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কীভাবে আচরণ করবে, সেই অনিশ্চয়তার মূল্য নির্ধারণ অনেক কঠিন।

ধরা যাক, একটি বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয়ে কারখানা করতে চায়। জমি, ভবন, যন্ত্রপাতি ও কর্মীদের প্রশিক্ষণে বিপুল অর্থ ব্যয় হবে। কারখানা তৈরি হয়ে গেলে সেটি বাক্সে ভরে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অর্থনীতিতে এ ধরনের ব্যয়কে ‘সাংক কস্ট’ বা অপরিবর্তনীয় বিনিয়োগ ব্যয় বলা হয়।

এই কারণেই বড় বিনিয়োগের আগে উদ্যোক্তা শুধু বর্তমান নীতি দেখেন না। তিনি ভাবেন আগামী ১০ বা ২০ বছর নিয়মগুলো কতটা স্থিতিশীল থাকবে। এই প্রশ্নের উত্তর অনিশ্চিত হলে তার প্রত্যাশিত মুনাফার হারও বেড়ে যায়। যে প্রকল্প স্থিতিশীল পরিবেশে লাভজনক হতে পারত, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও চুক্তিগত ঝুঁকি যোগ হওয়ার পর সেটি আর বিনিয়োগযোগ্য না-ও থাকতে পারে।

অর্থাৎ কোনো দেশকে বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করতে হয় না। প্রতিষ্ঠান দুর্বল হলে শুধু ঝুঁকির মূল্য বাড়িয়েই বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করা সম্ভব। এখানেই চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আধুনিক অর্থনীতি কেবল পরিচিত মানুষের মধ্যে লেনদেনের ওপর চলে না। একজন শিল্পোদ্যোক্তা সরবরাহকারীর কাছ থেকে কাঁচামাল কেনেন, ব্যাংক থেকে ঋণ নেন, গুদাম ভাড়া করেন, পরিবহন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করেন এবং দেশ-বিদেশের ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রি করেন। এই মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের সবাইকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন

না। তাদের সম্পর্কে টিকে থাকে চুক্তির ওপর। কিন্তু চুক্তির শক্তি শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে সেই চুক্তির পেছনে থাকা প্রতিষ্ঠানের ওপর।

বিচারব্যবস্থা ধীর হলে অর্থনীতি চলতে পারে, যদি ব্যবসায়ীরা বিশ্বাস করেন যে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটি নিরপেক্ষ হবে এবং তা কার্যকর করা যাবে। সমস্যা আরো গভীর হয় যখন ধারণা জন্মায় যে মামলা দীর্ঘায়িত করা, রাজনৈতিক প্রভাব কিংবা প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে শক্তিশালী পক্ষ দুর্বল পক্ষকে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে পারে।

তখন ব্যবসায়ীরা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের বদলে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পারিবারিক যোগাযোগ, রাজনৈতিক পরিচয় কিংবা দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক সম্পর্কের ওপর বেশি নির্ভর করতে শুরু করেন। ছোট পরিসরে এ ব্যবস্থা কাজ করতে পারে। কিন্তু বড় অর্থনীতির জন্য এটি যথেষ্ট নয়।

শুধু পরিচিত লোকের সঙ্গে ব্যবসা করলে একজন উদ্যোক্তা হয়তো কম দামে ভালো পণ্য দিতে সক্ষম, নতুন সরবরাহকারীর সুযোগ হারাবেন। ব্যাংক পরিচিত বা পর্যাণ্ড জামানত নেই এমন নতুন উদ্যোক্তাকে ঋণ দিতে দ্বিধা করবে। বিদেশি কোম্পানিও অপরিচিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদার হতে সতর্ক থাকবে। ফলে অর্থনীতি দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে। একদিকে থাকেন সেই 'ইনসাইডাররা', যারা জানেন কীভাবে ব্যবস্থা কাজ করে বা কাকে ধরতে হয়। অন্যদিকে থাকেন তারা, যাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তে অনিশ্চয়তার অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়।

আধুনিক অর্থনীতি শুধু ব্যক্তিগত আস্থায় চলতে পারে না। প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা। অর্থাৎ দুই পক্ষের ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও তারা বিশ্বাস করবে যে চুক্তি, সম্পত্তির অধিকার এবং নিয়মকানুন কার্যকর থাকবে।

এই আস্থাই ছোট প্রতিষ্ঠানকে বড় হতে সাহায্য করে, নতুন উদ্যোক্তার জন্য অর্থায়নের পথ খুলে দেয়, সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিস্তৃত করে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীকে স্থানীয় অংশীদারের সঙ্গে কাজ করার সাহস দেয়। অর্থাৎ আস্থা চুক্তির বিকল্প নয়। আস্থা চুক্তিকে কার্যকর করে।

বাংলাদেশ যখন তৈরি পোশাকের বাইরে ইলেকট্রনিকস, ওষুধ, প্রকৌশল, তথ্যপ্রযুক্তি, লজিস্টিকস, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং উচ্চমূল্য সংযোজনকারী শিল্পে বিনিয়োগ বাড়তে চাইছে, তখন বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ। এসব খাতে প্রাথমিক বিনিয়োগ বড়, প্রযুক্তি ও মেধা স্বত্ব গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিকল্পনার সময়কালও দীর্ঘ। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক অনিশ্চয়তার প্রভাব এখানে বেশি।

কম মজুরি শ্রমঘন শিল্পকে আকৃষ্ট করতে পারে। কিন্তু প্রযুক্তি ও পুঁজি নির্ভর শিল্পে শুধু শ্রম যথেষ্ট নয়। সেখানে বিনিয়োগকারী দেখবেন নিয়ম কতটা ধারাবাহিক, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি কতটা নির্ভরযোগ্য, বাণিজ্যিক বিরোধ কীভাবে নিষ্পত্তি হয় এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান কতটা পূর্বাভাসযোগ্যভাবে কাজ করে।

বাংলাদেশে ইতিবাচক কিছু পরিবর্তনও হচ্ছে। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া সহজ ও ডিজিটাল করার চেষ্টা হয়েছে এবং বিনিয়োগ-সংক্রান্ত সংস্কারের অগ্রগতিও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো স্বীকার করেছে। কিন্তু সংস্কারের সাফল্য কাগজে নয়, ব্যবসায়ীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়।

অনলাইনে অনুমোদনের ব্যবস্থা চালু করলেই হবে না, যদি ব্যবসায়ী মনে করেন কাজ এগিয়ে নিতে শেষ পর্যন্ত পরিচিত কাউকে ধরতে হবে। বাণিজ্যিক আদালত থাকলেই হবে না, যদি রায় কার্যকর হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ থাকে। ভালো বিনিয়োগ আইনও যথেষ্ট নয়, যদি প্রশাসনিক ব্যাখ্যা বারবার বদলে যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা এক দিনে তৈরি হয় না। একজন নিয়ন্ত্রক যখন প্রভাবশালী ও সাধারণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রয়োগ করেন, তখন আস্থা তৈরি হয়। আদালত যখন নিরপেক্ষভাবে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি করে, তখন সেই আস্থা আরো বাড়ে। একজন উদ্যোক্তা যখন রাজনৈতিক তদ্বির ছাড়াই ন্যায্যভাবে অনুমোদন পান, তখন রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজিও শক্তিশালী হয়।

এর বিপরীতটিও সত্য। একটি খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের প্রভাব শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ব্যবসায়ীরা একে অন্যের অভিজ্ঞতা জানেন। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা নতুন দেশে যাওয়ার আগে সেখানে থাকা বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা তুলনা করে সিদ্ধান্ত নেয়।

এই কারণেই বিনিয়োগনীতি শুধু কর ছাড়, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল কিংবা আর্থিক প্রণোদনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। এসব সুবিধা একজন বিনিয়োগকারীকে বাংলাদেশের দিকে তাকাতে উৎসাহিত করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থ বিনিয়োগ করবেন কি না, সেই সিদ্ধান্তে প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা বড় ভূমিকা রাখে। চুক্তি নির্ভরযোগ্য হলে একজন বিনিয়োগকারী কিছুটা বেশি মজুরি মেনে নিতে পারেন। নিয়ম স্থিতিশীল হলে কিছুটা বেশি করও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতাও সহ্য করা সম্ভব, যদি উন্নতির বিশ্বাসযোগ্য পথ দেখা যায়। কিন্তু নিয়মই যদি অনিশ্চিত হয়, সেই ঝুঁকির ক্ষতিপূরণ করা অনেক কঠিন।

বাংলাদেশের নিখুঁত প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন নেই। কোনো দেশেরই তা নেই। প্রয়োজন এমন একটি পরিবেশ, যেখানে বিনিয়োগকারী যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করতে পারবেন যে নিয়ম বোঝা যাবে, সিদ্ধান্ত খামখেয়ালি হবে না এবং বিরোধ হলে ব্যক্তিগত যোগাযোগের বদলে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাধান পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের বিনিয়োগ সমস্যাটি তাই শুধু অর্থের অভাবের সমস্যা নয়। দেশে ও বিদেশে বিনিয়োগের মতো পুঁজি আছে। আসল চ্যালেঞ্জ হলো এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে সেই পুঁজি আগামী নির্বাচন বা পরবর্তী ব্যবসায়িক লেনদেন পর্যন্ত নয়, ১৫ বা ২০ বছরের জন্য বিনিয়োগ করার আস্থা পাবে। বন্দর গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ। সুদের হার গুরুত্বপূর্ণ। করনীতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আস্থাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রতিটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ভেতরে আসলে একটি অলিখিত চুক্তি থাকে। বিনিয়োগকারী আজ অর্থ একটি দেশে রেখে যাচ্ছেন এই বিশ্বাসে যে, আগামী দিনের নিয়ম যথেষ্ট ন্যায্য ও পূর্বাভাসযোগ্য থাকবে, যাতে তার বিনিয়োগ একটি যুক্তিসংগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায়। বাংলাদেশের পরবর্তী উন্নয়ন পর্বে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষমতা অনেকটাই নির্ভর করবে বিনিয়োগকারীরা সেই অলিখিত চুক্তিকে কতটা আস্থা রাখতে পারেন তার ওপর।

আর কর ছাড় বা প্রণোদনার মতো প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা ঘোষণা দিয়ে তৈরি করা যায় না। প্রতিটি ন্যায্য, ধারাবাহিক ও পূর্বাভাসযোগ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে সেই আস্থা অর্জন করতে হয়।

লেখক: ড. মোহাম্মদ এ রব; যুক্তরাজ্য প্রবাসী অর্থনীতিবিদ এবং অর্থনৈতিক নীতি, ব্যাংকিং ও আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ফিল্যান্স পরামর্শক